সুন্দরবন : আবেগ ও বাস্তবতা

জয়ন্তকুমার সরকার

গবেষক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

অধ্যাপক ড. তপতী বসু

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান,

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'সুন্দরবন' নামটি আবিশ্ব মানুষের কাছেই চুম্বকের মত আকর্ষণ সৃষ্টি করে। ভ্রমণপিপাসু বা অনুসন্ধিৎসু মানুষ সকলের কাছেই সুন্দরবন এক অপার বিস্ময়। এর প্রতি প্রত্যেকটি মানুষ সুড়ঙ্গ-গভীর টান-ভালোবাসা অনুভব করে । তবে এ সুন্দরবনে নদ-নদী -সমুদ্রবেষ্টিত রয়েল বেঙ্গল টাইগার সহ বিচিত্র জীবন নিয়ে গঠিত। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ভূখণ্ডের সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে মাত্র ৪৮টি দ্বীপ সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে তার অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। বাকি ৫৪ টি দ্বীপে প্রায় ৪০-৪৪ লক্ষ মানুষের বসবাস ।সংরক্ষিত বনভূমির প্রাণীদের মতো আজ তাদেরও অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। অনির্দিষ্ট জীবন ,প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি, বিপন্ন অস্তিত্ব,বিরতিহীন সংগ্রামের মধ্যেই এখানকার মানুষের বেঁচে থাকা। জাগ্রত অরণ্য আর উদাসীন সাগরের মাঝখানে মানুষ খুঁজে পেতে চায় তার সুখের ঠিকানা ।সে ঠিকানায় মাঝে মাঝে হানা দেয় ভয়ংকর সুন্দর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।প্রবল বেগে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন। একে নগরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা,তার উপরে এই ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত মানুষকে দিকভ্রান্ত করে দেয়। তিল তিল করে গড়ে ওঠা দীর্ঘদিনের স্বপ্ন,সম্পদ চুরমার হয়ে যায় কয়েক ঘণ্টার দানবীয় ঝড়ের আঘাতে।

১৯৬০-১৯৯১--এই সময়ের মধ্যে ২৫ বার প্রবল ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে এই এলাকায়। তবে সম্প্রতি ২৫ শে মে ২০০৯ যে ঝড় আছড়ে পড়ল এই অঞ্চলে তার তুলনা সত্যিই বিরল। 'আয়লা' নামে বিখ্যাত হয়েছে সে ঝড়। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে তৈরি ঘূর্ণিঝড়গুলোর নাম কি হবে দুই সাগর সংলগ্ন ১৩ টি দেশের ট্রপিক্যাল সাইক্লোন রিজিওনাল বডি(TCRB) তার তালিকা বানায়।'আয়লা'নামটি মালদ্বীপের দেওয়া। এই বিধ্বংসী ঝড়ের প্রভাবে ভারতবর্ষের দিকের ৩৫০০

কিলোমিটার নদীবাঁধ এত বেশি জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা কল্পনাতীত। মূলত কৃষিনির্ভর এই অঞ্চল তিন মরশুম নিষ্ফলা ছিল ।রুটি-রুজির টানে দিশেহারা মানুষ ভিনরাজ্য এমনকি ভিনদেশে পাড়ি দিতে বাধ্য হলো। এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরেই এই অঞ্চলে কৃষকের সংজ্ঞা পাল্টাতে শুরু করেছিল। বড় কৃষক তো ছিলই না, ছোট চাষী মজুর ধরে চাষ করে সারা বছরের 'খোরাকি' যোগাড় করতে পারেন না। কৃষকের চরিত্র বদল হয়ে মূলত কৃষি-শ্রমিক, প্রান্তিক চাষী, ক্ষেত মজুরে ভরে গেছে এলাকা। বর্ধমানের কৃষকের সঙ্গে সুন্দরবনের কৃষকের সমস্যা, রুচি এবং চিন্তার যে অনেক ফারাক সেটা অনেক সময় বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে ।কৃষকের সমস্যা যেমন বীজ- সার- কীটনাশক -ডিজেলের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তেমনি সম্পৃক্ত সামাজিক চেতনার মধ্যেও। ব্যক্তি এবং ব্যষ্টির সেই দ্বন্দ্বে ব্যষ্টি চেতনাই যে কৃষককে ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেবে এটা না অনুভব করলে সমূহ বিপদ।

বহু তরুণ উপার্জনের তাগিদে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাঙ্গালোর, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র এমনকি আন্দামানের পথে পা বাড়াচ্ছে। তারা সমাজের কুড়ি শতাংশ তো বটেই। প্রথমে এরা পরিবারকে রেখে যেত। পরবর্তীতে সপরিবারে পাড়ি দিল মোটা টাকা রোজগারের আশায়। এতে কোন দোষ নেই। একুশ শতকের মানুষ তো আর কোনো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। কিন্তু বিপত্তি ঘটল অন্য জায়গায়। স্বাভাবিক শ্রমের সঙ্গে 'ওভার টাইম' খেটে কঠোর পরিশ্রমে সে তিল তিল করে পয়সা রোজগার করছে।সে পয়সায় ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ হয়ে বাড়তিও থাকছে। কিন্তু গ্রামে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে রেখে আসা এদের ছেলে বা মেয়েটি লেখাপড়ায় বেশিদূর এগোতে পারছে না। দিশেহারা মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে তাদের শৈশব অথবা কৈশোর। এদিকে তাদের বাবা মায়েরা ২-৩টি ভাষা শিখে হাতে বেশ কিছু টাকা নিয়ে ছয়-সাত মাস পরে যখন বাড়ি ফিরছে গ্রাম-সমাজের সঙ্গে তাদের মানসিকতা আর কাজ করছে না। মহেশ গল্পে 'গফুর' একদিন আমিনার হাত ধরে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষক গফুর রূপান্তরিত হয়েছিল শ্রমিক গফুরে। কৃষি- নির্ভর সুন্দরবনের এই নব্য যুবদের অবস্থানও তাই। কৃষক, ক্ষেতমজুর বা প্রান্তিক চাষী পরিবারের ছেলেমেয়েরা আজ পাড়ি দিচ্ছে শিল্পনগরীর দিকে ।একদিন সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে ভিন রাজ্যে যাওয়ার কথা তাঁদের কল্পনাতেও ঠাঁই পেত না। এখন আর স্থানের গণ্ডি তাঁকে বাঁধতে পারছে না। অর্থ উপার্জনের তাগিদ তাঁকে অনিবার্যভাবেই পেশাচ্যুত ও স্থানচ্যুত করছে।

কিন্তু এহ বাহ্য। একদিকে শিল্পাঞ্চলের অস্থায়ী শ্রমিক, অন্যদিকে গ্রামের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে সরে আসা-- এই দুই বৈপরীত্যের টানাপোড়েন তাকে নিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে। নির্বাচন, সামাজিক উন্নয়ন, মূল্যবোধ-- সবই তার কাছে নির্ধারিত হচ্ছে অর্থের নিরিখে।আজন্ম-লালিত সংস্কার আর গ্রাম সমাজের সরলতা এসব তার হৃদয়ে আর গুঞ্জন তোলে না। ক্রমশ ফিরে আসা দিনগুলো দীর্ঘায়িত হবে।ভোট আর খুব নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু ছাড়া গ্রামের টানে সে আর ফিরতে চায় না। কিছুটা সময় না গেলে অবশ্য বোঝা যাবে না যে সে ঠিক কোথায় শিকড় গ্রথিত করবে। শরীরের তাগদ কমার সঙ্গে সঙ্গে যখন উপার্জন কম হবে তখন তাদের সিদ্ধান্ত কি হবে সেটাই

এখন বড় প্রশ্ন।
আর এক দল তরুণ যাঁরা এলাকায় থাকছেন পড়াশোনা শেষ করে অথবা না করে, তাদের মধ্যে দ্রুত অর্থবান হওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠছে । এম. জি. এন. আর. ই. জি প্রকল্পে গতর খাটার লোক অপেক্ষা উমেদারি (স্থানীয় ভাষায় 'কোড়াদারি') করার লোক বেশি হয়ে যাচ্ছে। কেউ কাজ করতে চাইছেন না। সবাই এক অলীক আয়ের উৎস 'মাস্টার রোল' তৈরি করছেন।

আপাত নিরীহ সুন্দরবনের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে গত ১০-১২বছরে অদ্ভুত এক মেলার আয়োজন হচ্ছে । টিকিটহীন সেইসব মেলা দিনের পর দিন এমনকি মাসাধিককাল ধরে চলে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০-৩৫ হাজার টাকা খরচ হয় ।এই খরচ আসে জুয়ার(স্থানীয় ভাষায় ফড়)আসর থেকে ।পুলিশের উপস্থিতিতে এই আসরে সর্বস্বান্ত হয় গরিব মানুষ। এলাকায় চুরি-ছিনতাই বৃদ্ধি পায়। সব জেনেও শুধুমাত্র ভোটের কারণে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয় রাজনৈতিক দলগুলো।স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে চুক্তিতে দিনের পর দিন এই অবস্থা চলছে। বেলা শেষে টইটুম্বুর হয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রী ও মাকে অকথ্য গালিগালাজ এমনকি মারধর করছেন ভাবীকালের কর্ণধারেরা।

অনুমোদন লাগে না এসব মেলা করার জন্য। পুলিশ কস্ট দিলেই সাতখুন মাপ। এস.ডি.ও এবং ফায়ার ব্রিগেডের অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেন না ।থানার বড়বাবু থেকে গোটা পুলিশ প্রশাসন সাপ্তাহিক চুক্তিতেই মেলা চালান। অভিযোগ করলে একজন আরেকজনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এড়িয়ে যান। প্রবেশমূল্যহীন এইসব মেলায় গ্রাম এমনকি শহরতলির যুবতীদের সমাগমও ঘটে ।গভীর রাতের সেই অন্ধকার জগত সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষকে বড্ড কাঠখোট্টা করে দিচ্ছে। স্বাভাবিক প্রতিবাদ বন্ধ হচ্ছে অর্থ এবং ভীতির পরিমণ্ডলে। সাধারণ মানুষ খুব অসহায় বোধ করছেন। মানুষ ক্রমশ তার প্রতিবাদ ভুলে অচিরেই মিশে যাচ্ছে স্রোতে। জুয়ার আসরে আকছার ঘটছে মহিলাদের উপস্থিতি। আদর্শ-লজ্জা-ভয় সংস্কার এসব বিবেচিত হচ্ছে টাকার মাপকাঠিতে। তাই তিন হাজার টাকার মাসিক বেতনের আই.সি.ডি.এস-এর সরকারি চাকরির জন্য তিন লাখ টাকা দিতেও পিছপা নন মানুষ। এই অভিযোগও শোনা যায় মান- সম্মান ,ইজ্জত- আব্রুও বন্ধক দিতে হচ্ছে। এ বড় বেদনাহত করে আমাদের।

আর লেখাপড়া শিখে যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হচ্ছেন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার- অধ্যাপক-শিক্ষক বা অন্য পেশায় তাঁদের মধ্যে ঘরে ফেরার টান থাকছে না বা এলাকার প্রতি সহমর্মিতা কমছে মূলত দুটি কারণে। এক ,এলাকার অস্থির পরিবেশ ,স্কুলে পড়াশোনার অবক্ষয়। এস.এস.সি দিয়ে দূর থেকে যাঁরা আসছেন অধিকাংশ চাকরি পেয়েছেন এই মনোভাবে আসছেন, পড়িয়ে ছাত্র তৈরি করব-- এই মানসিকতায় নয়। সুন্দরবনের অধিকাংশ স্কুলের ছাত্ররা স্কুলের শিক্ষকদের উপরই নির্ভরশীল থাকে। সেখানে বিরাট ডিগ্রিধারী শিক্ষক ছিলেন না কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা ছিল প্রশ্নাতীত। অসম্ভব শেখানোর তাগিদ আর ছাত্রদের সন্তানতুল্য ভালোবেসে পড়ানোর গুনে যে রেজাল্ট হতো

আজ কিন্তু তা হচ্ছে না।৫-৬-৭ঘন্টা দূরত্ব অতিক্রম করে দু-তিনটি নদী পেরিয়ে এসে কোনরকম দায়সারা গোছের পড়িয়ে আবার ফেরার তাড়া তাকে বড় ক্লান্ত , ,ক্লান্ত করে দিচ্ছে। এক সময় এই অঞ্চল থেকে অসংখ্য ডাক্তার ,ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন।এখন অধিকাংশ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের বিজ্ঞান শাখা উঠে গেছে অথবা মুষ্টিমেয় দু-একজন ছাত্র পড়ছে। তাদের অধিকাংশই আবার পরবর্তীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে না। দুই, কী লাভ ফিরে গিয়ে খাল-বিলের দেশে? এত কষ্ট করে বিদেশী সাবান দিয়ে সোঁদা মাটির গন্ধ গা থেকে দূর করেছি, আবার কেউ সাধ করে ফিরে যায়? যায়না। যায় না বলেই ভাবনার সেতু রচিত হয় না। কেউ কাউকে চেনার প্রয়োজন বোধ করেন না। উত্তর প্রজন্মের কাছে অজানা থেকে যায় পূর্ব প্রজন্মের কৃতিত্ব। ছিন্নমূল হয়ে 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে তিনি কেবল মাত্র অর্থোপার্জনের যন্ত্র হয়ে যাচ্ছেন । বাড়ি ফিরে তার মনের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে (Second Chamber) আর অনুরণন তোলে না জন্মভূমির ভালো-মন্দ।
তৃতীয় সমস্যাটা আরো গভীর।যাঁরা ঐ অঞ্চলের ভূমিপুত্র এবং ওই অঞ্চলে চাকরি করেন তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু অংশ অদ্ভুত এক মানসিক দ্বন্দ্বের স্বীকার।স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বন্ধু-বান্ধবের চাপে সোনারপুর ,বারাসাত ,মধ্যমগ্রাম ,বসিরহাট বা শহরতলীতে কোথাও একটা ঘরভাড়া অথবা নিজস্ব ঘর বেঁধে থাকছেন ।সেখান থেকেই গ্রামে যাচ্ছেন চাকরি করতে (গ্রামে নিজস্ব জমিজমা, ঘরবাড়ি থাকতেও)। যে আশায় তার এই পরিকল্পনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না ।বরং বেশি স্বাধীনতা পেয়ে অচিরেই সে আদর্শচ্যুত হচ্ছে। ফলে চাকরিসূত্রে শরীরটা গ্রামে থাকলেও মনটা থাকছে শহরতলীতে তার পরিবারের কাছে। দোদুল্যমান মন নিয়ে ক্লান্ত শরীরে তাঁর আর ভালো লাগেনা। শুধু দিন গুজরান করাই সার। অথচ এঁদেরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় গ্রামের মানুষের স্বপ্ন -আশা- ভরসা।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় এখানে উল্লেখের প্রয়োজন। আগে সুন্দরবনের গ্রামে সারারাত ধরে যাত্রাপালা অভিনীত হতো। মানুষ সারারাত ধরে সেখানে থাকতেন। এখন কিন্তু সে প্রবণতা কমছে। রাত বারোটার পর খুব কম জায়গাতেই যাত্রাপালা দেখতে মানুষ থাকেন। শুধু তাই নয় ,এখন আর যাত্রাপালা দেখতে ভিড়ও হয়না ।সিডি, কেবল টিভির প্রভাব অনস্বীকার্য, কিন্তু তারচেয়েও বড় কারণ সুন্দরবনের মানুষ যাত্রাকে আর নিজস্ব সংস্কৃতি বলে মনে করেন না। আমাদের ছেলেবেলায় সুখে-দুঃখে যাত্রা, মনসা-মঙ্গল, বেহুলা ভাসান ,দক্ষিণ রায়ের পালা যেভাবে উন্মাদনা সৃষ্টি করতো এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে তা হাসির খোরাক মাত্র ।কিছু বছর আগেও গ্রাম মাতানো বুড়িছোঁয়া,পলাটু, ডাংগুলি, মার্বেল,কিত্ কিত,গাদন, হা-ডু-ডু এখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি টুসু বা ভাদু গানের মধ্যে হিন্দি গানের সুর শোনা যাচ্ছে। কীর্তনীয়ারাও এই ধারার বাইরে নয়। এটা খারাপ কী ভালো তা সময়ই বলবে।কিন্তু নিজস্ব ঘরানা হারিয়ে একটা 'হাঁসজারু' জনসংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। কাঠুরে, বাউলে ,মৌলে, ঘরামি করাতি ইত্যাদি পরিচয় দিতে এখন আর কেউ গর্ববোধ করে না।সন্ধ্যেবেলা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে নৌকো টানার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ আর ভাটিয়ালি সুরের গান শোনার অভিজ্ঞতা এখনকার যুবকদের আর হয় না। মাঝনদীতে নৌকার ছইয়ের মধ্যে রাত কাটানোর বিরল অনুভূতি বা কে নিতে চায়?

পূর্বসূরির পেশাকে ভালো না বাসা আর আধুনিক পেশার পক্ষে নিজেকে যোগ্য না করতে পারা-- এই দোদুল্যমানতায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবনের যুব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ।

সুন্দরবনের যুব মনন তাই এখন অদ্‌ভুত এক বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে দিশেহারা। রুটি-রুজির তাগিদ থাকবে,বড়ো হওয়ার স্বপ্নও থাকবে, ভালোবাসার জন্য মনের মানুষ থাকবে, থাকবে আরো অনেক, অনেক কিছু। কিন্তু যার জন্য তাদের এত কদর সেই আন্তরিকতা,পরের জন্য সব ফেলে ঝাঁপানো কোথায় হারিয়ে গেল রে? ও খোকা তোর মন কোথায়?

তথ্যসূত্র:

১.শ্রীখন্ড সুন্দরবন: সম্পাদনা: দেবপ্রসাদ জানা

২. আইলা ও তার পুনর্গঠন: সুভাষচন্দ্র আচার্য

৩. বই ভেসে যায়: সুপ্রীতি রায়

৪.নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র :সম্পাদক বিমলেন্দু হালদার (জুলাই 2009)বিবেকানন্দ রোড বাইলেন ।সোনারপুর। কলকাতা-১৫০

৫.সুন্দরবন ও আইলা ।সম্পাদনা: জ্যোতিরিন্দ্র নারায়ন লাহিড়ী ও সঞ্জয় মৌলিক। প্রকাশক: তেপান্তরের স্বপ্ন। গুড়াপ, হুগলি।